দৈনিক বাংলা

তারিখ ..3.1. JUL. 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম

গণশিক্ষার কয়েকটি চিত্র

উপরের এই শিরোনামে আমার আরো কয়েকটি লেখা ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। যাদের ঐ লেখাগুলি পড়ার সুযোগ হয়নি বা পড়ে থাকলেও তেমন বিশেষ কিছু মনে নেই, তাদের সুবিধার জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে পুনঃ উল্লেখ করি, কিভাবে চুয়াডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয়করণের ফলে স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা যদিও নিয়মিত ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছেন, তবুও বৎসর কাল অধিক বিনা পারিশ্রমিকে ছিলেন। তবে তাদের আর্থিক কষ্ট লাঘবের জন্য প্রাইভেট টিশনি করে তারা হাজার/পনেরশ টাকা আয় করে সংসার চালাচ্ছিলেন। এ ছাড়া তাদের উপায়ইবা কি ছিল? আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, এই অবস্থায় প্রচন্ড পরিশ্রম করে বাড়ির কাজ ও টিউশনির শেষে, স্কুলে ৩শ ছাত্র-ছাত্রী পড়াবার জন্য প্রধান শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকার কতকুটুক শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে।

এছাড়াও আরো দু এক ধরনের গণশিক্ষার প্রচেষ্টার কথা আমার আগের লেখায় বর্ণিত ছিল, যেমন দর্শনা, দামুরহুদা, চুয়াডাংগা স্বদেশ প্রেমিক শিক্ষিত যুবক যুবতী নিজেদের প্রচেষ্টায় বসত বাড়িতে যেমন তেমনভাবে দু তিন কক্ষবিশিষ্ট শনের ঘর করে কোন রকমের অবৈতনিক স্কুল চালাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কোন রকম ফি বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হয় না। তারা আশায় বুক বেঁধে আছেন কখন সরকারের সদয় দৃষ্টি পড়বে এবং সরকারী অনুদান, পারিশ্রমিক ইত্যাদি পাওয়া যাবে। চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের উপকণ্ঠে একটি মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারী স্কুল, পাকা বাড়ি খেলা-ধুলার জন্য যথেষ্ট জমি বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় যা জাতীয়করণের পরও (দু বছর পূর্বে) পরবর্তী চৌদ্দ মাসের না মিউনিসিপ্যালিটি না সরকারী/বেসরকারী মাহিনার সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

ইতিমধ্যে মাসখানেক আগে টাঙ্গাইল জেলার কালি-হাতীর বিবদমান এবং ভুঞাপুরের গোবিন্দদাসী ও কন্টাপাড়া গ্রামে এ ধরনের গণশিক্ষা প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখার সুযোগ হয়েছিল। যার গোড়া পত্তন ইতিবৃত্ত বা উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করলেও গণশিক্ষার বাস্তব চিত্রের কিছু জ্ঞান সংযোজন হবে বলে আমার ধারণা।

৪-৫টি স্কুল দেখার পর মনে হলো সবগুলো স্কুল ঘর নতুন টিনের, দরজা, চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ ইত্যাদি সব কিছুই যেন নতুন নতুন (কম মূল্যে) প্রশ্ন করে জানলাম যে, ২/১ জায়গায় পূর্বের স্কুল দীনহীনভাবে কোন রকমে চালু থাকলেও স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের অনুদানে কেউ কেউ স্কুল ঘর সংলগ্ন খেলা-ধুলার জন্য সামান্য জমি অনুদান করেন এবং অন্যেরা স্কুল ঘরের জন্য-টিন, বাঁশ, বেড়া, বেঞ্চ, টেবিল ইত্যাদি নগদ টাকা দিয়ে কিনতে সহায়তা করেন। অতি উত্তম কথা, সন্দেহ নেই। যখন জানতে পেলাম যে, প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাই হয় স্কুল ঘরের জন্য জায়গা-জমি দিয়েছেন অথবা অবশিষ্ট সকলেই ১৫,০০০/- হাজার করে টাকা (বেশীও না কমও না, নির্ধারিত) যেভাবেই হোক "অনুদান দিয়ে" সর্ব সাকুল্যে ৭৫,০০০/- টাকা সংগ্রহ করে এবং এই ৭৫,০০০/- টাকার বিনিময়ে স্কুল ঘরগুলো প্রায় নতুন অবয়ব।

যদিও হলফ করে বলতে পারবো না তবুও আমার ধারণা গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন বেকার যুবক, যুবতী যারা স্কুল ঘরের জন্য জমি বা টাকা অনুদান করে বোধ করি এ পন্থা অবলম্বন না করলে এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলির আবির্ভাব সুদূর পরাহত ছিল। আমার অভ্যাস মত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এমন কি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নানা প্রশ্ন করে এই ধারণা হলো যে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে আমি বিগত ১০ বৎসর অযাচিতভাবে বাংলাদেশের শত শত স্কুলে আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতির হার বা শিক্ষার মান দেখে হতাশ হয়েছি সেই অনুপাতে এই নতুন প্রক্রিয়ায় গজিয়ে উঠা শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার এবং শিক্ষার মান দেখে তুলনামূলকভাবে বলব আশাবাদী এবং খুশীই হয়েছি। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এই যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল বলে তড়িঘড়ি করে যেভাবেই হোক জায়গা জমি বা বিক্রি করে ১৫,০০০/- হাজার টাকা অনুদান দিলেন, তাদের চেয়েও কি শিক্ষাদীক্ষার এবং চরিত্র বলে উন্নততর স্থানীয় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের প্রতি অবিচার করা হলো না কি? স্বনির্ভর বাংলাদেশের আমার এক সহকর্মীর নিকট থেকে জেনে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। বাসাইর থানার বোইর পাড়া গ্রামে একজন দরিদ্র (এইচএসসি) সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় আড়াই বছর যাবৎ বিনা পারিশ্রমিকে অনানুষ্ঠানিক স্কুলে চাকরি পাবে আশায় ছিল কিন্তু শেষ পর্যায় নগদ টাকা অনুদান দিতে পারেনি বলে নির্বাচনীতে টিকতে পারল না।

বিপরীত, এটাও আমি বলতে বাধ্য এই প্রক্রিয়া গ্রহণ না করলে হয়তবা এরূপ অনেক অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের অংকুর গজাতো না এবং অনেক দরিদ্র শিশু, বালক বালিকা কোন দিনই স্কুল নামক বস্তুর সাথে পরিচিত হতো না আবার বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে "ঝড়ে পড়া" শিশুদেরও এরকম বিদ্যালয়ে ঠাঁই হতো না, আবারো বলতে হয় যে, অনেক (৪৬,০০০) প্রাথমিক বিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও অন্তত কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ে, (সারা দেশে বছরে প্রায় ২৫-২৬ লক্ষ) কারণ দর্শানো হয় যে এই সব "ঝরে পড়া" শিশুদেরকে তাদের গরীব কৃষক বাবাকে ধান ক্ষেতে বা চাষের ক্ষেতে পান্তা ভাত ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়, অতএব স্কুলে যাবে কি করে? মেয়েদেরকে গাছের পাতা, ডাল পালা কুড়িয়ে রান্নায় সাহায্য করতে বা গোবর কুড়াতে হয় তা না হলে দরিদ্র মায়ের সাহায্য হবে না। তা-হলে কি এখানে প্রশ্ন করা যায় না যে, অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশুরা ১০-৪·০০ টায় যাওয়া আসা করে। এই অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সময় সকাল ৭-১১ অথবা ১১·০০-৪·০০ অথবা ৪-রাত ৯টা করলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কি ভালো হতো না, যাতে কিছু শিশু তাদের গরীব মা বাবার কাজে সহায়তা করেও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারত। সাম্প্রতিককালে নোয়াখালী, লক্ষীপুর অঞ্চলের কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক স্কুলে এক একটি বেঞ্চে ৭-৮ জন করে বসেও ১০-১৫ জন শিশু শ্রেণীর ছেলে মেয়েদেরকে "পালাক্রমে দাঁড়াতে এবং বসতে হয়" দেখি।

একটি স্কুলে ৩ জন উপস্থিত শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন "ফাজেল" পাস যাদের একজন তৃতীয় শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন। এই স্কুলে যোগদানের পূর্বে যে মাদ্রাসায় পড়াতেন সেখানে তার মাহিনা তার কথামত ১৫০/- টাকা। আরেক "ফাজেল" পাস শিক্ষক পূর্বে যে মাদ্রাসায় পড়াতেন তার মাহিনা ছিল মাসে ৫০০/- টাকা, যা গ্রামবাসী চাঁদা করে তুলে দিতেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের দেশের আপামর মানুষ বলতে গেলে প্রায় কয়েক কোটি ভূমিহীন, বেকার, অর্ধ-বেকার, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিদের আয়ের পথ সৃষ্টি না হয় এবং যুগোপথ গণশিক্ষার ব্যবস্থা কমসে কম মোটামুটি নিরক্ষরতার অভিসাপ থেকে মুক্ত না হয়, ততদিন পরিবার পরিকল্পনা বনায়ন বা পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি সকল প্রকার জাতি গঠনমূলক মায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুদূর পরাহত। তাই সরকারের সাধ্য মত চেষ্টা ও সর্বোচ্চ টাকার বরাদ্দ, তার সাথে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধণ এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরো কিছু বাস্তব পদক্ষেপ প্রয়োজন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিগত ১০ বছর ধরে ১৩৮টি থানার ঋণ কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা ও গণশিক্ষা ইত্যাদির বিভিন্ন প্রকারের প্রায়াস ছাড়াও বাড়তি ফল হিসাবে একটি কথা এখানে বলা যায় যে, বিগত ১০ বছর ধরে তাদের অফিস প্রাঙ্গণে যে সর্ব বৃহৎ কক্ষটি তাদের সভা কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং নির্বাহী কর্মকর্তার সাপ্তাহিক সভা হয়, প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ হল হিসাবে সারা বছর ব্যবহৃত হয়, সেই বৃহৎ কক্ষটি আমরা সকাল ৭টা থেকে ১০টা (০৩ ঘন্টার জন্য) পর্যন্ত স্থানীয় গরীব নিঃস্ব বালক-বালিকা নিয়ে একটি অনানুষ্ঠানিক গণ শিক্ষা বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার করি। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৮০/৮৫ জন। বিগত ১০ বছরে সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা সামান্য জ্ঞান দান করার চেষ্টা করেছি। যদিও আরও বহু শিক্ষার্থী আমাদের এই স্কুলে ভর্তি হতে সব সময় ঘোরাফেরা করে। এই স্কুলের শিক্ষকগণ আমাদের স্বনির্ভর বাংলাদেশের নিয়মিত কর্মচারী অর্থাৎ পিয়ন, কেরানী, সহকারী হিসাবরক্ষক, টাইপিষ্ট ইত্যাদি। এই অতিরিক্ত কাজ ৭ টা থেকে ১০টা পর্যন্ত করার জন্য কোন অতিরিক্ত মাইনা দেবার আমাদের সংগতি নেই। যদিও আমাদের একজন কার্য নির্বাহী কমিটি সদস্য অন্তবর্তীকালীন সরকার (মাননীয় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন) স্বল্পকালীন নেতৃত্বের সময় তার ডিসক্রিসনারী ফান্ড (ইচ্ছাধীন, নৈমিত্তিক) থেকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিলে ব্যাংক সুদসহ সেই টাকা আমরা ৫/৬ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজনকে মাসিক ২০০/- টাকা এবং আরো ২ জন শিক্ষককে মাসিক ১৫০/- টাকা করে উৎসাহ ভাতার মত দিতাম। স্কুলের অন্যান্য সকল খরচ যেমন বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎ, পাখা ইত্যাদির জন্য খরচ এবং চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড ইত্যাদির সকলই স্বনির্ভর বাংলাদেশের টাকা। তাদের অন্যান্য কাজের কারণেই ঐ কক্ষটি মোতায়েন রেখেছেন। কিছু হৃদয়বান ব্যক্তির আনুকূল্যে স্কুলের বালক-বালিকাদের ঈদের সময় ফ্রক, শার্ট বা হাফ প্যান্ট দেয়া হয় এবং প্রতি সপ্তাহে ২/৩ বার অনির্ধারিত দিবসে সাধারণ নাস্তা যেমন কলা, শসা, বিস্কুট, বন রুটি, সয়া প্রোটিন বিস্কেট ইত্যাদি দেয়া হয়। ফলে তাতে স্কুলের হাজিরা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার ধারণা এ ধরনের স্কুল চালাতে গেলে মাসিক খরচ ২০/২৫ হাজার টাকা লাগত।

সামান্য মানসিক ও দৈহিক চেষ্টায় সমাজ সেবার অংশ হিসাবে কিছু ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি বর্গের সহায়তায় আমরা একটি প্রকৃত অর্থে অতি উচ্চমানে আনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। এরূপ ৪৬৪টি থানায় বহু অফিস, দফতর, স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে যে, ১০টা বা ১০·৩০ পর্যন্ত অবিরত থেকে সেই সব অঞ্চলে স্থানীয় বেকার শিক্ষিত যুবক/যুবতী, ২/৪ জন করে আরও অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় চালাতে পারেন না কি? প্রয়োজনে অতি সামান্য পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেও। এদিক থেকে স্থানীয় শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, বেকার শিক্ষিত যুবক/যুবতীকে অনুপ্রাণীত করে মাঠে নামাতে পারেন না কি? এ রকম আরো অনেক কিছু ভাবনার আছে। অবসর মুহূর্তে কর্তব্যের জন্য বা গলাবাজি না করে বা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভাবনী ক্রিয়াকান্ডের কথা জানতে, বাস্তবভিত্তিক কিছু কিছু সমাধানের পথ পাওয়া যায় বা সন্ধান দেয়া যায়।

সালাহউদ্দিন আহমেদ

পরিচিতি : লেখক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। বর্তমানে স্বনির্ভর বাংলাদেশের অবৈতনিক মহাসচিব।